সামাজিক উন্নয়নে এলিটদের ভূমিকা: একটি সমীক্ষা

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান[১] এবং ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ[২]

Abstract

The Role of Rural Elites has been studied in differet times in South Asia and in Bangladesh. The earlier studies show the areas of performance of Elites in maintaining the law and order situation of rural areas.The present study finds some significant evolutions and developments in the areas of performance of rural Elites. Now a days the rural Elites perform in various diversified social concerns of rural lifes including adoption of modern education and medicare against the only law and order concern of earlier times. Because of the progressive adoption of thoughts and actions of the rural Elites the whole rural Bangladesh is proceeding towards a prosperous future under the formal and informal leadership of those rural Elites. This paper would help the readers to realize the changing of rural Elites of Bangladesh in the social development of Bangladesh.

ভূমিকা

উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হলো উন্নয়নের প্রতি মানুষের ইতিবাচক ভূমিকা। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ এলিটেরা ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নেতৃত্বে তাদের অধিষ্ঠান সে কারণেই। ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা, প্রভাব এবং নেতৃত্বের অবস্থান এবং বিকাশ স্পষ্ট হয়। ভূমিকার বহুমুখিতা এলিটের দক্ষতার পরিচায়ক এবং তাদের অব্যাহত মর্যাদার জন্য জরুরী। সমাজঘনিষ্ঠ জীবন যাপনে অভ্যস্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আনুগত্য আদায়ে এবং মর্যাদার অবস্থানের সুরক্ষার জন্য এলিটদের সামাজিক ভূমিকা পালনে অগ্রাধিকার উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক প্রবণতা। সুতরাং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নে যেমন তারা ভূমিকা পালন করেন, তেমনি সমাজের ঐক্য-সংহতি রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ তারা গ্রহণ করে থাকেন। গ্রামীণ সমাজের নানা সমস্যা এবং অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপও তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক ব্যাধিস্বরূপ এই সমস্যাগুলো যেমন যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি গ্রামীণ সমাজের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী। ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষের জন্য সুষ্ঠু সংস্কৃতির চর্চা এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করার বিকল্প নেই। গ্রামীণ

---

১ সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২ সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ।

এলিটেরা এসব ভূমিকা শুধু পালনই করেন না বরং কখনো কখনো নিজেদের অপরিহার্যতা প্রমাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। ইতিবাচক উন্নয়ন প্রতিযোগিতার এই সাম্প্রতিক প্রবণতা নিঃসন্দেহে গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় এলিটদের সনাতনী ভূমিকার কার্যকারিতা এবং বর্তমানে সে ভূমিকার ব্যাপকতা পরিমাপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সে ভূমিকায় সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করাই বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য।

তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে:

এক. গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নের স্বরূপ উন্মোচন;

দুই. গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে এলিটদের অংশগ্রহণ (participation), ভূমিকা (role) পরীক্ষা; এবং

তিন. এ বিষয়ে ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য গবেষণার উপাদান সরবরাহ।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটির জন্য মূলতঃ সার্ভে বা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়নের প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং আবদ্ধ ও খোলা প্রশ্নের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাকর্ম, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় এলিট শ্রেণির ভূমিকাকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের সাক্ষাৎকার এবং তাদের সামাজিক ভূমিকা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণকেও এ গবেষণার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর তথ্যপ্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের (বিশালপুর ও মির্জাপুর) নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের ওপর পরিচালিত হয়েছে। বিশালপুর ইউনিয়নের মোট আয়তন ৫৪.৩৪ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৫৩টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ২৯৬২১ জন; এরমধ্যে পুরুষ ১৫৪০৫জন এবং মহিলা ১৪২১৬ জন। শিক্ষার হার ৪২%। নির্বাচিত আরেকটি ইউনিয়ন মির্জাপুরের মোট আয়তন ১৫.৫ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৪টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ৫০৭২৩ জন ; এরমধ্যে পুরুষ ২৫৪০৪জন এবং নারী ২৫৩০৯ জন। শিক্ষার হার ৬২% (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০১৯)।

এলিট ও গ্রামীণ এলিট:

সপ্তদশ শতকে কোনো পণ্যের বিশেষ উৎকর্ষকে বিশেষিত করবার জন্য 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে ঊর্ধ্বস্থ কোনো সামাজিক দলকে বোঝানোর জন্য এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে (Bottomore, 1964)। কোনো সম্প্রদায়ের উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন অধিকতর প্রভাবশালী কোনো দলকে বোঝাতে প্যারেটো এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছেন (Pareto, 1935)। প্যারেটো তাদেরকে এলিট বলে গণ্য করেছেন যারা সরকারের ওপর শক্ত প্রভাব খাটাতে পারেন এবং শাসক এলিট এ বিশেষ দলের লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। আর বাকি লোকজন নিয়ে গঠিত শাসক বহির্ভূত এলিট। Bottomore এর মতে, এলিটীয় দর্শন মার্কসীয় দর্শনের একটি বিপরীত অবস্থা (Bottomore, 1964)। ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাল মার্কস রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। Mills তাদেরকে এলিট শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা ক্ষমতা, সম্পদ ও জনপ্রিয়তা ভোগ করেন এবং সমাজের প্রধান প্রধান পদগুলো তাদের অধিকারে রাখেন (Mills, 1956:13)। তিনি আমেরিকান এলিটের একটি সমীক্ষা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে দেখান, 'ক্ষমতা এলিট' (Power Elite) সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গঠিত। ঐ ক্ষমতা এলিটেরা জনগণকে সিদ্ধান্ত দেবার অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে কোনো কোনো তাত্ত্বিক সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক এলিটদের ক্ষমতা বিবেচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, ব্যবসা ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারীরা সমাজে একটি বিশেষ এলিট শ্রেণির সৃষ্টি করে। এলিট তত্ত্ববিদ Dahl ক্ষমতা এলিট বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা সমাজের উঁচু শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উঁচু শ্রেণির লোকেরা সমাজে আধিপত্য প্রকাশে সমর্থ এবং তারা সর্বব্যাপী প্রভাবসম্পন্ন (Dahl, 1963)। এলিট তত্ত্বের আরেকদল বিজ্ঞানী এলিটতত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন-যেমন সমাজ, সমাজ কাঠামো, সমাজ সংগঠন ইত্যাদি (Cole, 1956; Lasswell, 1952; Kornhauser, 1965)। Lasswell এর মতে, এলিটের সদস্যরা সমাজে উঁচু অবস্থানে থাকেন (Lasswell, 1952)। প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক Cole এলিট বলতে সে দলকে বোঝান যারা সমাজের প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত কওে (Cole, 1956)। Kornhauser এলিট বলতে সামাজিক কাঠামোতে উঁচু অবস্থান ধারণকারীদের বুঝিয়েছেন (Kornhauser, 1965)। একই দলভুক্ত বিজ্ঞানীদের আরো একজন অনুসারী Anthony Giddens এ বিষয়ে সামান্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ' এলিট তারাই যারা সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদ দখল করতে পারেন' (Giddens,1973:3-4)।

জার্মান সমাজতাত্ত্বিক Gunter Endruweit (1984) তাঁর Elites as agents of economic development শীর্ষক প্রবন্ধে এলিট ও উন্নয়ন বিষয়ক তত্ত্বাদি পর্যালোচনা করেন। ঐতিহ্যবাদী

ও আধুনিকতাবাদী এলিট, এলিটের বিবর্তন, সফল ও ব্যর্থ উন্নয়নের নির্ধারক প্রভৃতির সর্বশেষ তত্ত্বের পর্যালোচনা করে Gunter Endruweit লিখেন, 'সাধারণভাবে সামাজিক উন্নয়ন ও নির্দিষ্টভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এলিটের সক্রিয়তা বিষয়ে একটি কার্যকর তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজনীয় অনেকগুলো উপাদান-উপকরণ আমাদের হাতে আছে। সেগুলো নিঃসন্দেহে দেখিয়েছে, তত্ত্বটি এখনো অসম্পূর্ণ' (Gunter Endruweit, 1984: 32-38)।

এলিট ও উন্নয়ন বিষয়ক তত্ত্বের এই অসম্পূর্ণতা মেনেই এই গবেষণা এগিয়েছে।

গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণ কৌশল

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের চিহ্নিতকরণ একটি অন্যতম বিষয়। গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে Schulze and Blumberg দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের চিহ্নিত করেছেন: (১) অবস্থানিক কৌশল (২) যশস্বী কৌশল (Schulze and Blumberg,1959)। বাংলাদেশে গ্রামীণ নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে এ দু'ধরনের পদ্ধতি অবিমিশ্র নয় বরং পদ্ধতিগত সংমিশ্রণে কখনো কখনো ভিন্নমাত্রিক নেতৃত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। এর বাইরে ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলও গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণে প্রয়োগ করা হয়।

১) অবস্থানিক (Positional)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter এর Atlanta City-র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে পরিচিত ছিলো (Floyd Hunter, 1953)। অবস্থানিক এলিটবর্গ হলেন সে সব লোকজন যারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কর্তৃত্বে অবস্থানিক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানিক এলিটদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (১) ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানিক এলিট মোট ১২২জন; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬জন, সমবায় সমিতি নেতা ২৩জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১জন, রাজনৈতিক দলের ইউপি পর্যায়ের নেতা ১২জন।

২) যশস্বী (Reputational)

যশস্বী পদ্ধতি অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনে যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। এ বিশেষ শ্রেণির লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন। তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায়। সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter প্রথম Regional city-তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন (Floyd Hunter, 1953)। যশস্বী পদ্ধতির অনেক কৌশলই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী কৌশল হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যারা সবচাইতে বেশি মূল্য এবং সম্মান পাবেন তারাই যশস্বী নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে (Karim, 1990) এবং Harjinder Singh তাঁর পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে যশস্বী পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন (Harjinder Singh, 1976)। মূলতঃ এসব প্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় যশস্বী এলিট মোট ৮৮জন। ১০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে যশস্বী এবং অবস্থানিক উভয় এলিটীয় যোগ্যতার বিদ্যমানতা একই সাথে লক্ষ্য করা গেছে।

৩) ইস্যু পারটিসিপেশন (Issue Participation)

নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে ইস্যু পারটিসিপেশন পদ্ধতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা কর্তৃত্ব করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের চিহ্নিত করতে যশস্বী কৌশলের পাশাপাশি ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশল ব্যবহার করেছেন (করিম, ২০০২:৮৪-৮৫)। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাদেরকে এ পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণা এলাকায় ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিত করা যায়নি।

এলিট নির্ণায়ক উপাদান

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের

মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল (Karim, 1990:38)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় নেতৃত্বের জন্য জমির মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র উপাদান নয়। এর সাথে অর্থনৈতিক সামর্থ্য, শিক্ষা, শহরের সাথে যোগাযোগ, প্রশাসনিক জ্ঞান, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং গ্রামীণ বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা রাখার যোগ্যতার সমন্বয় ঘটলেই নেতৃত্বের অবস্থান পাওয়া যায় এবং এলিটীয় মর্যাদা অর্জিত হয়। সুতরাং যারা উচ্চ বংশীয় ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ করা যায়, তাদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হবে, যিনি বা যারা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি(বর্গ)।

ভূমিকা (Role)

এ পরিভাষাটি সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি প্রাবরিত (ওভারল্যাপ্ড) কিন্তু একই সময়ে ভিন্ন অর্থে ও প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে ভূমিকা একটি প্রদত্ত 'সামাজিক অবস্থান' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এ সামাজিক অবস্থান এক গুচ্ছ (ক) ব্যক্তিগত গুণ এবং (খ) কার্য দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারে। সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা ভূমিকা পালন বা সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার একটি উপাদান হিসেবে একটি আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে, 'ভূমিকা'কে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রমের ধরনসম্পন্ন পরম্পরা বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

'সামাজিক বিজ্ঞানে প্রায়শঃ কোনো অর্থ নির্ধারণ ব্যতীতই 'ভূমিকা'কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে' (Neiman & Hugher, 1951: 141-49)। 'ভূমিকা'-র দুটি সাধারণ ব্যবহার হলো: (ক) সমাজের একক হিসেবে 'ভূমিকা' এবং (খ) সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার অন্য নাম হিসেবে 'ভূমিকা পালন'। প্রথমটি ব্যবহার করেছেন R. Linton এবং দ্বিতীয় ধারণার উন্নয়ন ঘটান G.H. Mead (Linton, 1936 Ges G.H. Mead, 1934).

T.R. Sarbin-এর মতে 'ভূমিকা' হলো আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রম বা চুক্তির নির্দিষ্ট ধরনসম্পন্ন পরম্পরা (Lindzey, 1954:223-58)।

জনগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। আর এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

একান্ত জরুরী (বেগম, ২০০৩:৬৪)। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের কৌশল অতি সম্প্রতি উন্নয়ন সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে (আলম, ২০০৬: ২০৫-২১৭)। আর এই জন অংশগ্রহণে উন্নয়ন প্রচেষ্টার নেতৃত্বে থাকেন গ্রামীণ এলিট শ্রেণি। গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিট শ্রেণি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখেন।

ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার অসংহতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো এর সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ঝাটি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। অনেক ক্ষেত্রে এসব দ্বন্দ্ব-কলহের শ্রেণি চরিত্র বিদ্যমান, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক অসংহতি, হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থ রক্ষার প্রবণতা-এসব বিবাদের কারণ। একটি সমাজের একটি নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোও রয়েছে। এ সাংগঠনিক কাঠামোর নেতাদের বলা হয় মাতব্বর {জানসেন (বাংলায়), ১৯৯০:৯৮}। যাদেরকে এখানে বলা হবে গ্রামীণ এলিট। গ্রামীণ এসব এলিটই গ্রামীণ ঝগড়া-ঝাটি এবং অসদাচরণের ক্ষেত্রে বিচার করে থাকেন (বিশ্বাস, ২০০২:৮০)। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের সংহতি, ঐক্য তথা সার্বিক উন্নতির জন্য কলহ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। বেশিরভাগ গ্রামীণ এলিটই এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে তৎপরতা প্রদর্শন করেন (Rumi, 1985:128)। পারিবারিক বিবাদ, জমি নিয়ে (মালিকানা, সীমানা প্রভৃতি) বিবাদ, ধার-কর্য নিয়ে বিবাদ, বস্তুগত সম্পদ নিয়ে বিবাদ, মালিক-শ্রমিক বিবাদ, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব নিয়ে কলহ-বিবাদ গবেষণা এলাকার গ্রামীণ ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ এসব বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ এলিটেরাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। বিবাদ মীমাংসার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালিশ (সালিশী অর্থে)। সালিশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এর বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে বিবাদ-মীমাংসা হয়ে আসছে তার নাম সালিশ। পরিবারের বা একটি গৃহস্থালীর মাঝে যে সকল বিবাদের উদ্ভব হয় তার মীমাংসা করেন পরিবার প্রধান। একই বাড়ির দু'পরিবারের বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব বাড়ি প্রধানের। বিবাদ বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গেলে ক্রমান্বয়ে পাড়া প্রধান, গ্রাম প্রধান বা গ্রামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের এখতিয়ারে চলে যায় (ইসলাম, ২০০৩:১৮৯)। শেষোক্ত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় গ্রাম্য সালিশ মীমাংসা বা সালিশ। গ্রাম্য শান্তি-শৃঙ্খলা এবং বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসায় সালিশের ভূমিকা অতুলনীয় এবং মানসিক, আর্থ-সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি দিক দিয়ে গ্রামীণ সালিশের গুরুত্বও অপরিসীম (শহিদুল্লাহ,১৯৯২:১৬২)। এসব বিবাদ সালিশে নিস্পত্তি করা না গেলে গ্রামীণ সংহতি যেমন বিনষ্ট হতো, তেমনি বিবাদ নিস্পত্তিতে গ্রামবাসীদের আইন-আদালতের আশ্রয় নিতে হতো। এতে গ্রামবাসীদের ভোগান্তির পাশাপাশি প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতো। সুতরাং সালিশের আর্থিক গুরুত্ব সীমাহীন।

সারণি - ১.১: গ্রামীণ এলিটদের সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করেন	১৪৫ জন	৭২.৫%
সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করেন না	৪৭ জন	২৩.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	০৮ জন	৪%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি ১.১ অনুযায়ী গ্রাম্য ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার জন্য ১৪৫ জন (৭২.৫%) গ্রামীণ এলিট সালিশীতে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সচেতন এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা সমাজের সংহতি রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। সামাজিক মূল্যবোধ, গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা তাদের কাছে সর্বোচ্চ প্রাধান্যের বিষয়। সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা যায়। সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণকারী এ শ্রেণির এলিটদের মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার, মাতব্বর, প্রামাণিক, শিক্ষক, রাজনৈতিক দলের সদস্যরা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকার তুলনায় গ্রামীণ এলিটেরা সালিশী ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। এতে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় গ্রামীণ সমাজের সংহতি ও কল্যাণে অবদান রাখা যায়। গ্রামীণ সাধারণ মানুষও সালিশ মীমাংসায় ভূমিকার ভিত্তিতেই এলিটদের মর্যাদা ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করেন। নিজেদের মর্যাদা, প্রভাব এবং ক্ষমতা চর্চার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এ সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণকে এলিটেরা সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। বিবাদ নিস্পত্তির অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার তুলনায় সালিশ প্রক্রিয়ার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। কারণ গ্রামীণ সালিশ মীমাংসায় বাদী-বিবাদীর কোনো অর্থ ব্যয় হয় না, সাক্ষীরও অভাব হয় না (শহিদুল্লাহ্, ১৯৯২:১৬৮)। সর্বোপরি সালিশ বৈঠকের রায় দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। তাছাড়া কোর্ট-কাচারী ব্যয়বহুল ও দুর্নীতিযুক্ত। সেখানে ন্যায্য বিচার পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোর্ট-কাচারীতে ফাইল এদিক-ওদিক করতে গেলেই টাকার দরকার। থানা-পুলিশও ঘুষ ছাড়া কাজ করতে চায় না। আর তাই কোর্ট-কাচারী এবং থানা-পুলিশের কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার । এছাড়া কোর্টে অথবা থানায় সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচারের ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু গ্রামীণ সালিশ বৈঠকে এ বিষয়গুলো (মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষের লেন-দেন ইত্যাদি) যথেষ্ট সহজ নয়। কারণ সালিশী বৈঠকে মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্রুত প্রতিবাদ হয় এবং প্রমাণিত হলে সাক্ষীকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। তাই আজও গ্রামীণ ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ সালিশই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর আশ্রয়স্থল হিসেবে

বিবেচিত হয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ, ভাইয়ে-বোনে বিবাদ, পড়শী-পড়শী বিবাদ, গোষ্ঠীগত বিবাদ, অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিবাদ অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের সব রকম বিশৃঙ্খলার মীমাংসা হয় গ্রামীণ সালিশে (Rumi, 1985;129)। তাই গ্রামীণ এলিটেরা এ ধরনের সালিশী বৈঠকে অংশগ্রহণকে তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতার জন্য এবং গ্রামীণ সমাজের ঐক্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। অবশ্য আতিউর রহমানের (১৯৯১) মতে, পুরোনো ক্ষমতাবানদের আদি প্রতিষ্ঠান সালিশের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়লেও নব্য ক্ষমতাবানদের আচরণ, সম্পদ আহরণ ও নিপীড়নকে সম্মানীয় ও সহনীয় করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা এখনো মোটেই গৌণ নয়। আপাত নিরপেক্ষতার ভান করলেও 'সমাজ' সালিশ আসলে শ্রেণী নিপীড়নের হাতিয়ার। মাতব্বরদের অবস্থানও সে প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে (রহমান, ১৯৯১:১১৫)। এ পর্যবেক্ষণটিতে ঐ ধরনের বিচার প্রক্রিয়ার আর্থ-সামাজিক গুরুত্বকে পর্যাপ্ত মাত্রায় বিবেচনায় নেয়া হয়নি বলে দাবি করার সুযোগ আছে। ক্ষেত্র বিশেষে ঐ ধরনের প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও গ্রামীণ সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এর বিকল্প কিছুও গড়ে ওঠেনি। সমাজ নামক সংগঠনটির ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যেই সালিশের মাধ্যমে কোনো আরোপিত শাস্তি না দিয়ে ঝগড়া-বিবাদের একটি আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করা হয় যার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরকারি আদালতের চেয়ে গ্রাম্য আদালতে বেশি বিবেচনা করা হয় (বিশ্বাস, ২০০২:৯৯)। উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করেন না। তবে এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদের বেশিরভাগই সালিশী মীমাংসার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছেন। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে অথবা পরিবার প্রধান না হওয়ায় অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সালিশে অংশ নিতে পারেন না। ব্যবসায়ী ও শিক্ষক গ্রামীণ এলিটেরা এ শ্রেণিভুক্ত। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সালিশী মীমাংসার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। অবশিষ্ট ৮ জন (৪%) গ্রামীণ এলিট গ্রামীণ সালিশে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোনো মতামত দেননি। তাদের কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করতে চাননি। অনেকে গ্রামীণ সালিশেও ঘুষ-দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিধায় অনাস্থা হিসেবে সালিশে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন বলে জানিয়েছেন।

সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসায় ঘুষ, দুর্নীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সাম্প্রতিক প্রবণতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাতে এ ধরনের সালিশের রায়ের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ঐক্য, শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই গ্রামীণ এলিটেরা বিচারিক প্রক্রিয়ার এ সনাতন পদ্ধতিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট থাকেন। পক্ষপাতদুষ্ট রায় যে গ্রামীণ সংহতিকে মাঝে মধ্যে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয় না তা-ও অস্বীকার করা যায় না। বাদী-বিবাদীর অনাস্থায় সালিশ কখনো কখনো ইউনিয়ন পরিষদে ন্যস্ত করা হয়। কেউ কেউ প্রাতিষ্ঠানিক আইনী লড়াইয়ের জন্য আদালতে মামলা-মোকদ্দমাও

করে থাকেন। এই উভয় ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা লক্ষণীয়। আইনী প্রক্রিয়া এবং আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষকে গ্রামীণ এলিটদের দ্বারস্থ হতে হয়। শিক্ষিত এবং শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ থাকায় এসব ব্যাপারে তারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। বিচার প্রক্রিয়া যেটাই হোক না কেন, গ্রামীণ বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ এলিটদের তাৎপর্যপূর্ণ বিচারিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ঘুষ-দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে গবেষণা এলাকায় সালিশীর রায় নিয়ে উত্থাপিত নানা প্রশ্নে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ এ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সালিশী মীমাংসায় আস্থা কমছে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের গ্রামীণ সমাজ নামক সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের প্রশ্নে বিভাজনের রাজনীতি অনেকটা দায়ী বলে ধারণা করা হয়।

শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

সব উন্নতির মূল হচ্ছে শিক্ষা। এর ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য উন্নয়ন কাঠামোর স্তর গড়ে ওঠে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ১৭ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সে লক্ষ্য রূপায়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমেই সাধারণতঃ তেমন অঙ্গীকারবদ্ধ জনশক্তি গঠনের চেষ্টা করা হয়। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ সমাজে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সমতা আনয়ন করার নৈতিক মনোবল পোষণ করবেন সেটিই সবাই আশা করেন। বাংলাদেশ সরকারও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক খাতটিকে যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে বটে; কিন্তু বেশির ভাগই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অন্যদিকে বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন গ্রামের জনসাধারণের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এ ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন পুরোপুরি গ্রামীণ এলিট শ্রেণির ওপর নির্ভরশীল। অবকাঠামোর জন্য ইঁট, বালি, সিমেন্ট, বাঁশ, টিন, চেয়ার, বেঞ্চ এমনকি প্রতিষ্ঠানের জমি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদিও তাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে গ্রামীণ মক্তব, কওমী মাদ্রাসা, মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রামীণ এসব এলিটের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। তবে এসব সহযোগিতাকে তারা প্রভাব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার মনে না করে বাহ্যত পরকালীন শান্তির পুঁজি মনে করেন। তবে এটা ঠিক স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে এ ধরনের সহযোগিতা বেশ কার্যকর। ধর্মীয় এসব শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার সম্প্রসারণে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখতে পারে। গবেষণা

এলাকার প্রত্যেকটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন গ্রামীণ এলিটেরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তিতে উদ্বুদ্ধকরণে, শিক্ষা সামগ্রী বিতরণে, শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপে স্থানীয় এসব এলিটের নানামাত্রিক ভূমিকা লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের অবস্থান যাচাই করা হবে:

সারণি - ১.২: স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন	১৫৬ জন	৭৮%
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন না	৩৭ জন	১৮.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	০৭ জন	৩.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি (১.২) অনুযায়ী ১৫৬ জন (৭৮%) গ্রামীণ এলিট শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন বলে জানিয়েছেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত এবং সচেতন। ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক, কলেজের প্রভাষক, ঐতিহ্যিক এলিট এবং আনুষ্ঠানিক এলিটেরা এ শ্রেণিভুক্ত। শিক্ষার প্রতি তাদের মনোভাব বেশ ইতিবাচক। তাদের মতে, শিক্ষা ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উত্তরদাতা এ শ্রেণির এলিটেরা কম-বেশি আন্তরিকভাবে শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হন। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে ভূমিকার প্রসারতার ব্যাপ্তী হ্রাস পাচ্ছে মনে করা হয়। শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা রাখার আকাঙ্খা ব্যাপক কিন্তু সাধ্য সীমিত। তাই যৎসামান্য সামর্থ্য অনুযায়ী তারা শিক্ষার জন্য ভূমিকা নয় বরং কিছু একটা করতে চান বলেই তাদের ধারণা। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অবশ্য তাদের সে প্রয়াসকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়নে যে স্থানীয় জমিদার-ভূ-স্বামীদের ভূমিকা দেখা যায়, তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়েও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা চলমান। শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) উদ্যোগ

উদ্যোগ অর্থে এখানে নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগকেই বোঝানো হবে। গবেষণা এলাকার বেশিরভাগ গ্রামীণ এলিট বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কওমী মাদ্রাসা, মক্তব, দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে জড়িত। মূলতঃ গ্রামীণ এলিটদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠছে। অর্থ, শ্রম, মেধা এবং নানারকম ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত এসব উদ্যোগ বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চালিত হয়। এ প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি, স্থান নির্বাচন, শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালন এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম মনিটরিং অন্যতম। তবে এ ধরনের উদ্যোগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থাকার প্রশ্নে কখনো কখনো গ্রামীণ এলিটেদের মধ্যে দলাদলির রাজনীতি তৈরি হয়। এতে কখনো কখনো গ্রামীণ সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত বিবদমান পক্ষের মধ্যে সমঝোতা অথবা ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অবস্থানকে নিরঙ্কুশ করতে সক্ষম হন।

(২) উদ্বুদ্ধকরণ

বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সবার জন্য শিক্ষানীতির আলোকে গ্রামীণ এলিটেরা শিক্ষাকে মানুষের মৌলিক অধিকার বিবেচনা করে শিক্ষার বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা পালনের আগ্রহ লালন করেন। শিক্ষাকে গ্রামীণ এলিট শ্রেণী সমাজ ও মানব উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকরী উপাদান বিবেচনা করেন। তারা তাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে ছাত্র-অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের সে নৈতিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তাদের উপলব্ধি মহাত্মা গান্ধীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, 'রাজনৈতিক মুক্তি কখনোই আসবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ কথা মনে করবে যে, তাদের পরিবর্তন তাদের চেষ্টার মাধ্যমেই আসতে হবে এবং তারা যা চায় সেভাবেই ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে (Chowdhury, 1978:4)। শিক্ষাকে বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম মনে করা হয় (Rahman, 1986:229)। সামাজিক কুসংস্কার সমস্যার সমাধানে শিক্ষার বহুমুখী ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এ কারণেই শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটেরা সাধ্যমতো ভূমিকা রাখতে চান। Rumi (1985) তার গবেষণায় লক্ষ্য করেছিলেন, বেশিরভাগ গ্রামীণ এলিট শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখলেও কিছু সংখ্যক গ্রামীণ এলিট এ ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করেন (Rumi, 1985:134)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় এ ধরনের অপতৎপরতার সক্রিয়তা দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা যে একেবারে বাধাহীন ও নিরুদ্বিগ্ন তা-ও নয়। বাধা বা প্রতিবন্ধকতা এলে বরং গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব

তৈরি হয়, যেটি উন্নয়ন দৃষ্টি ভঙ্গির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামীণ এলিটদের শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা পরিমাপের দ্বিতীয় পরিমাপক হিসেবে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলকে ভিত্তি করে যে জরিপ চালানো হয় তাতে দেখা যায়, উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলকে শিক্ষার উন্নয়ন হিসেবে তারা বিবেচনা না করলেও এ কাজটি তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করতে চেষ্টা করেন। শুধুমাত্র নিজেদের সন্তানদের নয় বরং অনুসারী এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে নিরলস উদ্বুদ্ধ করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। শিক্ষা যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনের অবিকল্প মাধ্যম সেই বোধে উজ্জীবীত করেন গ্রামীণ এলিটেরা। গবেষণা এলাকার এলিটেরা লজিং মাস্টার {স্থানীয়ভাবে জায়গীর বলা হয় (যারা গ্রামীণ এলিটদের বাড়িতে থেকে-খেয়ে তাদের সন্তানদের পড়াশুনা করায়)} রেখে তাদের সন্তানাদির পাশাপাশি সাধারণ গ্রামবাসীর সন্তানদের লেখাপড়ার পথ সুগম করে থাকেন।

বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটেরা নারী শিক্ষা বিস্তারে সরকারি উদ্যোগের প্রশংসা করলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তারা জানান, সরকার নারী শিক্ষা এবং অবৈতনিক উপবৃত্তি প্রদান করলেও স্থানীয় এলাকায় স্কুলের সংখ্যা কম হওয়ায় এবং কোনো মহাবিদ্যালয় না থাকায় এ অঞ্চলের নারীরা সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের মতে, শুধু তাদের এলাকায় নয় বরং সারা দেশের গ্রামাঞ্চলের চিত্র এ রকমই। গ্রামীণ এলিটেরা মনে করেন, সম্মান এবং জীবন মানের উন্নতির জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য তারা তাদের মেয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অধিক যত্নবান এবং অনুসারী গ্রামবাসীদেরও এ ব্যাপাওে যথেষ্ঠ উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। তবে বিয়ে সংক্রান্ত দৃষ্টিকোন থেকে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে এখনো গ্রামীণ কিছু কিছু এলিট নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। উপযুক্ত পাত্রের অভাব এ ক্ষেত্রে উত্থাপিত সাধারণ অভিযোগ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সে পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে গ্রামীণ শিক্ষিত তারুণ্যের দৃষ্টিভঙ্গি বেশি ক্রিয়াশীল। উত্তরাধিকার সূত্রে সনাতনী পেশায় নিযুক্ত না হয়ে সরকারি চাকুরি প্রাপ্তির প্রত্যাশা এখন গ্রামীণ তরুণদের বৈষয়িক লক্ষ্য পূরণের প্রধান মাধ্যম। চাকুরিজীবি স্ত্রী সেখানে সহায়ক শক্তি।

সারণি ১.২-এ দেখা যায়, মোট ৩৭ জন (১৮.৫%) গ্রামীণ এলিট শিক্ষার উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখেন না বলে জানান। মূলতঃ এ শ্রেণীর এলিটেরা বয়স্ক এবং অল্প শিক্ষিত। শিক্ষার উন্নয়নে তাদের কোনো ধরনের ভূমিকা আছে কি-না তা তারা স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে পারেন না। বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতা এবং শিক্ষার প্রতি গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধকরণকে তারা উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করতে চান না। বরং গ্রামীণ এলিট হিসেবে এটা তাদের দায়িত্বশীলতা বলে মনে করেন। ৭ জন (৩.৫%) গ্রামীণ এলিট এ ক্ষেত্রে উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন। তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে

তাদের অবদানের মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত নন। যদিও মাঠ জরিপকালীন সময়ে দেখা গেছে, তারা ইরি-বোরো মৌসুমের পর স্থানীয় কওমী মাদ্রাসাগুলোকে ঋণ অথবা টাকা সাহায্য দিচ্ছেন। কিন্তু এটাকে তারা ঠিক ভূমিকা মনে করেন না, বরং পরকালীন শান্তির জন্যই এসব দান-খয়রাত গ্রামীণ এলিটেরা করে থাকেন। এমনকি মাদ্রাসার অনেক ছাত্রকে তারা লজিং রেখে পড়া ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করে থাকেন।

(৩) বস্তুগত সাহায্য প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের এ ধরনের ভূমিকার মধ্যে দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ সামগ্রী এবং শিক্ষা সামগ্রী প্রদান উল্লেখ্যযোগ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সরকারি-বেসরকারি অনুদান প্রাপ্তিতেও গ্রামীণ এলিটেরা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকেন। উদ্যোগ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং বস্তুগত সাহায্য প্রদানে গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখছেন স্থানীয় এলাকায় শিক্ষার হারের ধারাবাহিক উন্নতি তারই প্রমাণ বহন করে। সুতরাং নিষ্ঠাপূর্ণ এ ভূমিকাকে যথাপোযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে কাঠামোবদ্ধ করা গেলে তার সুফলের ব্যাপ্তি আরো বেশি প্রসারিত হবে।

শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ধ্রুপদী ভূমিকার মূল্যায়নে বলা যায়, শিক্ষার উন্নয়নে তারা যত্নবান এবং আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় এলাকার শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ার দায়ও অনেকটা তাদেরই। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পরিবর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বের প্রতি তারা অধিক মনোযোগী। আর এর জন্য ক্ষমতাসীন দলের প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ এবং তৃণমূলে রাজনীতির নতুন মেরুকরণ তৈরি হতে দেখা যায়। ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতি তাদের এই বিশেষ মনোযোগের মূল লক্ষ্য শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তাদের ভূমিকা রাখা নয়, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে কমযোগ্য বা অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে আর্থিক সুবিধায় লাভবান হওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। এর ফলে মানসম্মত শিক্ষকের অভাবে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। নিজেদের সন্তানদের শহরের ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর মাধ্যমে উন্নত ভবিষ্যত গড়ার যে অঙ্গীকার গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে দেখা যায় সাধারণ গ্রামবাসীর সন্তানদের শিক্ষার উন্নয়নে তাদের সে অঙ্গীকারের অভাবের দায় তাদের রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

কুসংস্কার, সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের অভাবে নানাবিধ রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ। মূলতঃ গ্রামীণ জীবনে আর্থ-সামাজিক অন্যান্য সমস্যার ব্যাপকতা

স্বাস্থ্য সমস্যার গুরুত্বকে ম্লান করে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সংবিধান স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। এ মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার' (Millennium Development Goal-MDG) আলোকে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০২০ এর বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৫,৭৩২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৪.৯২ শতাংশ (প্রথম আলো, ১জুন, ২০১৯)। যদিও ২০০৭-২০০৮ এর বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ৫,৪৭০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৬.২৭ শতাংশ। গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬:১২৮)।

সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের পরও গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যাকে গ্রামীণ উন্নয়নের একটি বড় অন্তরায় মনে করা হয়। এ অন্তরায় দূরীকরণে গ্রামীণ এলিটেরা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করেন। রোগ সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে গ্রামীণ এলিটেদের ভূমিকা অনন্য। গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা তুলে ধরা হলো:

সারণি- ১.৩: স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন	১৫৬ জন	৭৮%
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন না	৩৭ জন	১৮.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	০৭ জন	৩.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি (১.৩) অনুযায়ী ১২৯ জন (৬৪.৫%) গ্রামীণ এলিট স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখেন। এ ধরনের ভূমিকাকে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক, পরামর্শমূলক, চিকিৎসামূলক এবং বস্তুগত সাহায্যমূলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি পান, বাসি পচা খাবার না খাওয়া, শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং বিভিন্ন ধরনের মহামারী সম্পর্কে সচেতন করা বিষয়গুলোকে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা ও আর্থিক সাহায্যকে বস্তুগত সাহায্যমূলক, প্রাথমিক চিকিৎসা

ও ঔষধপত্র সরবরাহকে চিকিৎসামূলক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও হাসপাতাল সম্পর্কে পরামর্শকে পরামর্শমূলক ভূমিকার অর্ন্তভুক্ত করা যায়। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রম বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় গ্রামীণ এলিটেরা চাল, ডাল, টাকা, পয়সা এমনকি গাছের ফল-মূল (কলা, ডাব, ডালিম, পেয়ারা ইত্যাদি) দিয়ে তাদের সহযোগিতা করে থাকেন এবং এ কাজটি তারা নিঃস্বার্থভাবেই করে থাকেন। সহমর্মিতার এ চিত্র গ্রামীণ সমাজেই সম্ভব শহুরে সমাজে তা দুর্লভ বটে।

উত্তরদাতা ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট চিকিৎসা ক্ষেত্রে অথবা স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখেন না বলে জানান। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং অল্প শিক্ষিত এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা চিকিৎসা সম্পর্কে অসচেতন এবং তারা নিজেদের চিকিৎসার ব্যাপারেই অন্য গ্রামীণ এলিটদের ওপর নির্ভরশীল। তবে প্রয়োজনে তাদের অনুসারীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে টাকা-পয়সা ধার-কর্য দান করতে তারা কার্পণ্য করেন না।

উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ২৪ জন (১২%) এ সংক্রান্ত মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যতোটুকু সহযোগিতা তারা করেন সেটুকু ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে চান না।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৯)। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিমাণ ১০৯০ জনে দাঁড়িয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এ ভূ-খণ্ডের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। কাজেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে একদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে মানব উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬:১৩০)। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে । পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (সিপিআর) ১৯৭৫ সালে শতকরা ৮ ভাগ হতে বর্তমানে ৬১.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসস্টিকস, ২০১৮)।

পরিবারের কল্যাণই পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিবারের লোকসংখ্যা নিজেদের বস্তুগত সামর্থ্যের আয়ত্বের মধ্যে রেখে পরিবারের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার কথা পরিকল্পিত পরিবারের ধারণায় বলা হয়ে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় আনতে সর্বজনীন পরিবার পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। যে সমস্ত উপকরণ বা যার মাধ্যমে গর্ভসঞ্চারে বাধা প্রদান করা

হয়, সে সমস্ত উপকরণ বা মাধ্যমকে সাধারণভাবে পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা হয় (হক ও অন্যান্য ২০০৩:২৬২)। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষা এবং সচেতনতার অভাবের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মধ্যে কুসংস্কারের কারণে এ হার আরো বেশি। জনসংখ্যা বেশি হলে তা পরিবার, সমাজ তথা দেশের জন্য নানা মাত্রায় ও নানা বিবেচনায় ক্ষতিকর। অতিরিক্ত জনসংখ্যা জাতীয় অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায় ও হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। তাই পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার নানামুখী সমস্যার কার্যকর এবং টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়। মোট কথা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক সুখ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ এলিটেরা যেমন নিজ নিজ পরিবারের টেকসই সুখ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তেমনি সাধারণ গ্রামবাসীদেরও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

সারণি - ১.৪: জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

বয়সের স্তর	গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
২১-৩০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	১১ জন	৫.৫%
	মতামত প্রদানে বিরত	০৯	৪.৫%
	মোট	২০ জন	১০%
৩১-৪০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	৫২ জন	২৬%
	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না	০ জন	০%
	মতামত প্রদানে বিরত	১০ জন	৫%
	মোট	৬২ জন	৩১%
৪১-৫০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	৬৩ জন	৩১.৫%
	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না	৭ জন	৩.৫%
	মতামত প্রদানে বিরত	১৬ জন	৩১%
	মোট	৮৬ জন	৪৩%
৫১-৬০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	৬ জন	৩%

	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না	১২ জন	৬%
	মতামত প্রদানে বিরত	১৪ জন	৭%
	মোট	৩২ জন	১৬%
	সর্বমোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি (১.৪) অনুযায়ী ২১-৩০ বছর বয়সী ১১ জন (৫.৫%) এলিট স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান। এ শ্রেণির অবশিষ্ট ৯ জন (৪.৫%) গ্রামীণ এলিট অবিবাহিত হওয়ায় মতামত প্রদানে বিরত থাকলেও ভবিষ্যতে দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন বলে জানান। ৩১-৪০ বছর বয়স শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ৫২ জন (২৬%) জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই তাদের পারিবারিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে দ্বিধাহীন চিত্তে জানান। এ শ্রেণির ১০ জন (৫%) গ্রামীণ এলিট এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও কেউ নেতিবাচক উত্তর দেননি যেটি তাৎপর্যপূর্ণ।

৪১-৫০ বছর বয়সী গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মাত্র ৭ জন (৩.৫%) অতি রক্ষণশীল ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পন হওয়ায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এতে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশি হওয়ায় অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে তাদের এলিটিয় মর্যাদাও হুমকীর সম্মুখীন। এ শ্রেণির এলিটদের মধ্যে মোট ১৬ জন (৮%) গ্রামীণ এলিট পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের পরও সংকোচ বোধের কারণে জবাব প্রদানে বিরত থেকেছেন যেটি মাঠ জরিপে প্রতীয়মান হয়েছে। ৫১-৬০ বছর বয়সী গ্রামীণ এলিট শ্রেণির ৬ জন (৩%) গ্রামীণ এলিট জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। অবশিষ্ট ১২ জন (৬%) এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক জবাব প্রদান করেছেন। প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অন্য ১৪ জন (৭%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত জবাব প্রদানে বিরত থেকেছেন প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মোট ৬ জন (৩%) এলিট সচেতন ও শিক্ষিত হওয়ায় ঝুঁকিমুক্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আস্থা রেখেছেন বলে জানান। সংকোচবোধ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ১৪ জন (৭%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনো জবাব প্রদান করেননি। মোট ২০০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে ১৩২ জন (৬৬%) গ্রামীণ এলিট জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন, যা জাতীয় পর্যায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের হারের চেয়ে (৬৬%-৬১.৬%=৪.৪% ভাগ) বেশি। নিজে না স্ত্রীরা পদ্ধতি গ্রহণ করেন, সে ব্যাপারে জানাতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

আইসিডিআরবি'র (আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র) গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জন্ম নিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে দুই

কোটি ৮০ লাখ বিবাহিত নর-নারী রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ দম্পত্তি আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে জন্ম হার ৩ থেকে কমিয়ে ২.২ ভাগে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে (প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল, ২০০৭)।

নিজেদের পাশাপাশি গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের একান্ত অনুসারীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। যদিও নেতিবাচক প্রচারণা এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে ব্যাহত করার অভিযোগ রয়েছে এক শ্রেণির গ্রামীণ এলিটের বিরুদ্ধে (Rumi, ১৯৮৫: ১২০-১২৮)। কিন্তু গবেষণা এলাকায় এ ধরণের প্রবণতা লক্ষণীয় নয়। বরং গ্রামীণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিপরীতে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে জনমত সৃষ্টিতে এলিটেরা অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গ্রামীণ এলিট-জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য তৈরি হয়েছে বলা যায়। এলিট শ্রেণির সচেতন প্রয়াসে গবেষণা এলাকায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে দাবি করা হয়েছে। এ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও নিম্নমুখী। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা স্থানীয় সরকার, (ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ) ১৯৮৩ এর ৩৮(সি) ধারায় উল্লিখিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে থাকে (হক ও অন্যান্য, ২০০৩:২৬৫)। এ কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা বস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচীর সাথে এলিটেরাও উদ্বুদ্ধমূলক কাজ করে থাকেন। সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ স্থাপনে গ্রামীণ এলিটেরা কার্যকর ভূমিকা রাখেন।

ক্যাফেটেরিয়া প্রক্রিয়া

ক্যাফেটেরিয়া প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় বিভিন্ন প্রকার জিনিসের মধ্য থেকে যে কোনো একটি জিনিস পছন্দ করা। কোনো পদ্ধতি কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না (হক ও অন্যান্য, ২০০৩:২৬৩-৬৪)। সংকোচ এবং লজ্জার কারণে সাধারণ মানুষ উপযুক্ত পদ্ধতি বাছাইয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। গ্রামীণ এলিটদের সাথে অনুসারীদের এমন এক ধরনের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয় যাতে তারা তাদের সকল সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা গ্রামীণ এলিটদের কাছে অকপটে বলতে পারে। গ্রামীণ এলিটেরাও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচার করে সঠিক পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন। পদ্ধতিগুলো হলো: (ক) অস্থায়ী পদ্ধতি (খ) স্থায়ী পদ্ধতি। বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশে জাতীয় উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। সরকার সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য এবং জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় এলাকায় জন্ম নিয়ন্ত্রণকে জনপ্রিয় করতে আন্তরিকভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

স্থানীয় এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি সেটিই প্রমাণ করে।

চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

চুরি-ডাকাতি গ্রামীণ সমাজে মারাত্মক সমস্যা হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান। ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর তফসিল-১ এর ২য় অংশে বর্ণিত ক্ষমতা অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ ইউনিয়নের অপরাধ দমন, চুরি, ডাকাতি রোধে পাহারা, টহলদারী এবং থানা পুলিশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সীমিত সংখ্যক গ্রাম পুলিশের দ্বারা পুরো ইউনিয়নের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য তাই এর অধিবাসীদেরই কাজ করতে হয়। নিজ এলাকার নিরাপত্তা এবং চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটেরা রাতে পালা করে গ্রাম পাহাড়া, পুলিশের সাথে যোগাযোগ, সন্দেজনক ব্যক্তি সম্পর্কে থানায় রিপোর্ট প্রদান, গ্রাম পুলিশদের সহযোগিতা এবং স্থানীয় এলাকায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বারদের তাগিদ প্রদান করে থাকেন। সরকার কর্তৃক গৃহীত কমিউনিটি পুলিশিং এর নেতৃত্বেও রয়েছেন গ্রামীণ এসব এলিট। স্থানীয় এলাকার নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ এমন উদ্যোগ এবং কার্যক্রম গ্রহণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংহতির সংস্কৃতির এক অনন্য উদাহরণ। তাদের এ অনবদ্য ভূমিকা যেমন প্রশংসার দাবিদার তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় এলাকার সন্দেহজনক এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি সম্পর্কে এলিটদের মধ্যে কারো কারো উদাসীনতা অথবা নির্লিপ্ততা এবং কখানো কখনো পৃষ্ঠপোষকতা স্থানীয় এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দেখা দেয়।

যুব সমাজের উৎকর্ষ সাধনে এবং সংস্কৃতিগত উন্নয়ন সাধনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ সমাজে নৈতিকতাকে খুব গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত অনুশাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা বিকাশে গ্রামীণ এলিটেরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। অপেক্ষাকৃত বয়ঃজোষ্ঠ গ্রামীণ এলিটেরা নৈতিকতার প্রশ্নে অধিক তৎপরতা দেখান। তরুণ শিক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা যুব সমাজের উৎকর্ষ সাধনে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ এবং খেলাধুলার ওপর জোর দেন। সম্প্রতি আকাশ সংস্কৃতির দাপটে গ্রামীণ সংস্কৃতি চর্চায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয়। যুব সমাজের মননশীলতা বিকাশে যেটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ ধরনের অপসংস্কৃতির আমদানীতে এক শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা দায়ি। এ কারণেই গ্রামীণ সামাজিক জীবনের কঠোর বিধি-নিষেধ বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে এসেছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিয়মিত খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির

বিকাশে এবং যুব সমাজের মনন গঠনে গ্রামীণ এলিটেরাই ভূমিকা রাখেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে যুব সমাজকে অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নিজ সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন গ্রামীণ এলিটেরা। ব্যক্তি উদ্যোগে পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করার এবং তাদের মনন গঠনে প্রয়াস নেন এলিটেরা। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে যেমন তারা সক্রিয়, তেমনি ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনে যুব সমাজের উৎকর্ষ সাধনে এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালনেও গ্রামীণ এলিটেরা আন্তরিক। প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, মাদকের বিস্তার এবং গ্রামের ব্যাপক মানুষের শহরে স্থানান্তরের কারণে গ্রাম পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অতীত ঐহিত্য অনেকটাই ক্রমহ্রাসমান। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহারে গ্রামীণ এলিটদের সন্তানদের আসক্তি এবং তরুণদের মাঝে মাদকের বিস্তারের ব্যাপারে এলিটদের উদাসীনতার কারণে সামাজিক ভারসাম্যের অভাবে গ্রামীণ স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্য বিনষ্ট হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়।

মাদকের বিস্তার রোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

মাদক এক অভিশাপের নাম। এ অভিশাপের কালো থাবা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামের উঠতি বয়সের তরুণেরা কৌতুহলবশতঃ ধুমপান শুরু করলেও সে অভ্যাস এক সময় আসক্তিতে পরিণত হয়। একসময় এ ধরনের আসক্তি তাদেরকে মাদকের প্রতি প্রলুব্ধ করে। এ প্রলুব্ধি তাদের জীবনকে সর্বশান্ত করে দেয়। গ্রামীণ সমাজ নানা রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যাওয়ায় এর অতীত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। তারপরও সীমিত সক্ষমতা এবং দায়িত্বানুভূতির কারণে গ্রামীণ এলিটেরা মাদকের কবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষার প্রানান্ত চেষ্টা করে থাকেন। যুব সমাজের চলাফেরায় নজরদারী এবং তাদের মধ্যে নৈতিকতার বিকাশের মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধে ভূমিকা রাখেন গ্রামীণ এলিটেরা। তাদের উদ্যোগেই আসক্ত যুবককে সামাজিকভাবে বয়কট এবং শাস্তির মুখোমুখি করা হয়। কখনো কখনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এ ধরনের অপতৎপরতা রোধ করা বাহ্যত কঠিন হলেও সামাজিক বন্ধন শক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটেরা সে অপতৎপরতাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে থাকেন। উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে কেউ কেউ ধুমপায়ী হলেও ১০০% গ্রামীণ এলিটই মাদকের বিরুদ্ধে তাদের শক্ত অবস্থান তুলে ধরেছেন। তাদের এ অবস্থান সব সময় গ্রাম পর্যায়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকর উদ্যোগের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে গ্রামীণ এলিটদের আন্তরিকতা সত্ত্বেও মাদকের বিস্তার রোধ করা খানিকটা কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে গ্রামীণ এলিটদের এ উপলব্ধি স্পষ্ট যে, মাদকের বিস্তার রোধ করতে

না পারলে গ্রামীণ সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক গতিময়তা বিনষ্ট হবে। তাই গবেষণা এলাকার নিরীক্ষিত এলিটেরা মাদককে গ্রামীণ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং সংহতির জন্য হুমকি বিবেচনা করেন। নগরায়নের প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির প্রসার মাদককে গ্রামীণ পর্যায়ে সহজলভ্য করে তুলেছে। গবেষিত দুটি ইউনিয়নের মধ্যে শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় মির্জাপুর ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে মাদকের অধিক বিস্তার লক্ষণীয়।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

আইনের বিধান অনুযায়ী বাল্য বিবাহ বলতে সে বিয়েকে বোঝায় যেখানে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সে কোনো একজন শিশু। আর শিশু বলতে তাকেই বোঝায় যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বছরের কম এবং নারী হলে ১৮ বছরের কম। রাষ্ট্রীয় আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। জাতিসংঘ শিশু সনদেও নিষেধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ দেশে ১৯ বছরের কম বয়সী মেয়েদের প্রায় অর্ধেকেরই বেশি বিবাহিত এবং এ বয়সের শতকরা ৫৮ ভাগ ইতোমধ্যে মা হয়েছে অথবা সন্তান সম্ভবা (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০০১: ৯)। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১০-১৪ বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ ও ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ বর্তমানে বিবাহিত। গ্রামীণ পরিবেশে একদিকে ছেলেরা একটু বড় হলেই অভিভাবকেরা তাদের কাজে পাঠানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন অন্যদিকে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্যও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে তাদের ধারণা, এতে আবার আইনের কী আছে? মেয়ে বিয়ে দেয়া একান্ত নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করে গ্রামের মানুষ। অথচ দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বাল্য বিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং শিশু অধিকার পরিপন্থী। বেশিরভাগ দেশেই প্রচলিত আইনে বিয়েতে স্বাধীনভাবে নারীর সম্মতিদানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বহু দেশেই এ আইন প্রতীকী মাত্র। ১৯৯২ সন থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশে শিশু অধিকার সম্পর্কে সমাজের সকলের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করে। এ ধরনের অধিকার শিশুদের সব সময়ই রয়েছে। তবে এর পরিপূর্ণ প্রকাশ রয়েছে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে যা ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ১ লা জুলাই পর্যন্ত ১৯১ টি দেশ এ সনদটি অনুমোদন করেছে এবং এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শিশু সম্মেলন ঘোষণায় অন্যতম স্বাক্ষরদাতা দেশ এবং এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সনদে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে বিশেষ কিছু সুরক্ষা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন ১৮ বছরের নিচে মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না। ২১ বছরের নিচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না। সম্প্রতি

সরকার উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতির ভিত্তিতে আদালতের পর্যবেক্ষণসাপেক্ষে ১৬ বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য আইন পাশ করেছে (বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।

বাল্য বিবাহের কারণ

বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় বাল্য বিবাহের কারণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, কতিপয় মৌলিক উপাদান (factors) বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ বৃদ্ধির জন্য ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো পিতা-মাতার দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বাল্যবিবাহের ফলাফল সম্পর্কে অসচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন বাস্তবায়ন না হওয়া, দাদা-দাদর জীবদ্দশায় নাতবৌ দেখার প্রত্যাশা এবং যৌতুক পাওয়ার আকাঙ্খা। তাছাড়া বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্ক প্রতিরোধ অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার অন্যতম কারণ। বিবাহের ক্ষেত্রে কুমারীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। যার ফলে অননুমোদিত যৌন ক্রিয়া থেকে রক্ষা করার জন্য বাবা-মার দৃষ্টিতে বিয়ে হলো নিরাপত্তা বিধানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা। কিশোরী মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে ওঠার বিষয়টি কোনো কোনো সমাজে বাঞ্ছনীয় নয়। তাদেরকে পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হয় এবং এতে তাদের সুরক্ষা থাকবে বলে ধারণা করা হয়।

অশিক্ষা-অজ্ঞানতার বন্ধনে জড়ানো বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠী বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০% মেয়েই ১৫ বছরের মধ্যে মা হয়ে যায় (স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ১৯৯৬)। মাতৃ মৃত্যুর কারণসমূহের ওপর ১৯৭৬-৮৫ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার ২০-৩৪ বছর বয়সী নারীদের মাতৃ মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি (সার্ক মেয়ে শিশু পরিকল্পনা, ১৯৯১-২০০০)।

বাল্য বিবাহের এ ভয়াবহ সমস্যার আবর্তে দেশ যখন নিমজ্জিত, তখন তা প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় না হওয়ায় এর প্রভাব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষতঃ বর্তমান গবেষণা এলাকায় এর ভয়াবহ প্রভাব আরো বেশি লক্ষণীয়। স্থানীয় একটি পত্রিকার সূত্র ধরে বলা যায়, এ অঞ্চলে বাল্য বিবাহের কারণে স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রী কমে যাওয়া, অপুষ্টি, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি, শিশু-মাতৃ মৃত্যু বৃদ্ধি সর্বোপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত পত্রিকায় বলা হচ্ছে প্রশাসনের উদাসীনতায় শেরপুর উপজেলার গাড়ীদহ, খানপুর, বিশালপুর (গবেষণা এলাকার অন্তর্ভুক্ত) ও মির্জাপুর (গবেষণা এলাকার অন্তর্ভুক্ত) ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় প্রতিদিন

বাল্য বিবাহের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সাম্প্রতি এ প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণতঃ নিম্নবিত্তের পরিবারে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রীদের বাল্য বিবাহ বেশি হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে দু'একটি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা হলেও প্রশাসন কর্তৃক কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় বাল্য বিবাহ বেড়ে চলেছে বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে। স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধকারীরা যে স্থানীয় এলাকার গ্রামীণ এলিট তা ধারণা করা যায়। উক্ত পত্রিকা আরো উল্লেখ করেছে, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী এবং এনজিও'র প্রচেষ্টায় দু'টি বাল্য বিবাহ রোধ হলেও এর পেছনে প্রশাসন বা থানা-পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই (দৈনিক বগুড়া, ১৪ আগস্ট, ২০০৭)। স্থানীয় প্রভাবশালী এবং শিক্ষক এসব ব্যক্তি এলিট মর্যাদার অধিকারী ।

সারণি: ১.৫: বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিট

প্রদত্ত উত্তর	সংখ্যা	শতকরা হার
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখেন	১৩২ জন	৬৬%
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখেন না	৪৮ জন	২৪%
উত্তর প্রদানে বিরত	২০ জন	১০%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি ১.৫ এ দেখা যায়, নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ১৩২ জন (৬৬%) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখেন। প্রথমতঃ বাল্য বিবাহের কুফল তুলে ধরে তারা নিয়মিত গ্রামবাসীকে সচেতন করেন। কদাচিৎ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের চেষ্টাও করে থাকেন। ইউপি নেতৃত্ব, শিক্ষক, গ্রাম্য ডাক্তার এবং রাজনৈতিক সচেতনতাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটেরা এ শ্রেণিভুক্ত। স্থানীয় সরকারগুলোকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। তাদের মতে জন্ম ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক এবং মানুষকে বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক মাত্রায় সচেতন করা হলে বাল্য বিবাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ৪৮ জন (২৪%) গ্রামীণ এলিট বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে তাদের ভূমিকাকে চিহ্নিত করেননি। তাদের মতে, আইনের সঠিক বাস্তবায়নই প্রতিরোধের সর্বোত্তম মাধ্যম। এ ধরনের ভূমিকায় থানা-পুলিশ ও আইনী জটিলতা এবং প্রতিবেশিদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টির আশঙ্কায় এ শ্রেণির এলিটেরা এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা নিতে চান না। সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরামর্শ প্রদানেই তারা দায়িত্ব শেষ করেন। বাকী ২০ জন (১০%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং

কম সচেতনতাসম্পন্ন। বরং এসব এলিটদের বিরুদ্ধে স্থানীয় এলাকায় বাল্য বিবাহ সংগঠনের অভিযোগ রয়েছে। তবে গ্রামীণ এলিট শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার আলো বিকশিত হওয়ায় এ প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রচলন ব্যাপক। বাল্য বিবাহের ফলে পরিকল্পিত পারিবারিক জীবনের অভাবে দ্রুত সন্তান-সন্তানাদির জন্ম হয়, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠিত হওয়ায় উপার্জন হ্রাস পায়, কম বয়সে সন্তান জন্মদান করায় সন্তানের পুষ্টিহীনতার পাশাপাশি মায়ের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয় এবং পুরুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। বাল্য বিবাহের এসব কুফল সম্পর্কে এলিটেরা সচেতন। তাই তারা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতার চেষ্টা করে থাকেন। এর কুফল সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সতর্ক করতে ভূমিকা রাখেন।

যৌতুক প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

বিয়েতে জবরদস্তিমূলক লেন-দেন যৌতুক বলে পরিচিত। যৌতুক গ্রামীণ সমাজে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ রয়েছে। এ আইন অনুযায়ী বিবাহের যে কোনো পক্ষ অন্য পক্ষের নিকট হতে বিবাহের সময়, আগে বা পরে বিবাহের পণ হিসেবে যদি যৌতুক নেয় বা দাবি করে, তবে সে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে অপরাধ করেছে বলে গণ্য করা হবে। উক্ত আইনে বলা আছে 'যৌতুক বলতে যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে-

ক) বিবাহের এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে, অথবা

খ) বিবাহের যে কোনো পক্ষের পিতা-মাতা বা যে কোনো পক্ষের কোন ব্যক্তি বিবাহের সময়, আগে কিংবা পরে বিবাহের পণ হিসেবে নেয়, দেয় বা দাবি করে, বুঝায় (তবে ইসলামী শরীয়ত আইনে দেন মোহর যৌতুক পর্যায়ে পড়বে না)।

এ আইনে যৌতুকের শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা অথবা উভয়ের বিধান রয়েছে (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, যা ১৫ই জুন ১৯৮৫ হতে কার্যকর করা হয়েছে)। গ্রামীণ সমাজে উপরোক্ত আইনের কোনো কার্যকারিতা লক্ষ করা যায় না। এমনকি এ আইন সম্পর্কে সাধারণ গ্রামবাসীর অজ্ঞতা বিস্মিত হবার মতো বিষয় বটে।

সরকারি-বেসরকারি ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা সত্ত্বেও যৌতুক বিরোধী কোনো মনোভাব সংশ্লিষ্ট গবেষণা এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি। তাদের ধারণা মেয়ে পক্ষকে যৌতুক দিতেই হবে, না হলে তার মেয়ের বিয়ে হবে না। তাই মুখে অনেকে যৌতুকের বিরুদ্ধে কথা বললেও গোপনে তারা যৌতুক প্রথাকে সমর্থন করে। কার্যতঃ গ্রামীণ সমাজে অবৈধ এ পন্থাটি

উপঢৌকন বা উপহার হিসেবে বৈধতার সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষণীয়। গরীবদের ক্ষেত্রে যেটি যৌতুক ধনীদের ক্ষেত্রে সেটি উপঢৌকন হয়ে যায়। যৌতুকের ব্যাপারে গ্রামীণ এলিটদের ভাবনা কী এবং এ ক্ষেত্রে তারা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা পরীক্ষার জন্য তাদেরকে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে তারা যৌতুক এবং বাল্যবিবাহকে সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সারণি ১.৬ যৌতুক ও বাল্যা বিবাহ সমস্যা বিষয়ে এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
যৌতুক ও বাল্য বিবাহকে মারাত্মক সমস্যা বিবেচনা করেন	১৬২ জন	৮১%
এ ধরনের সমস্যা অনুধাবনে মনোযোগী নন	২২ জন	১১%
মতামত নেই	১৬ জন	৮%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণিতে (১.৬) যৌতুক এবং বাল্য বিবাহকে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ১৬২ জন (৮১%) গ্রামীণ এলিট। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা যৌতুকের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের পাশাপাশি এটি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা, লেখা পড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ, আইনানুযায়ী শাস্তি সম্পর্কে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগান। তাদের মতে, আজ ছেলের বিয়েতে যৌতুক নিলে আগামীকাল মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে হয়। ফলে এ প্রথা কারো জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ছাড়াও গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রেখে যৌতুক প্রতিরোধের চেষ্টা করে থাকেন। অধিকন্তু কেউ যৌতুক লেন-দেন করলে সামাজিকভাবে বয়কটের হুমকি প্রদান করেন। গ্রামীণ এলিটদের মতে, গ্রামীণ সালিশী মীমাংসার প্রায় ৬০-৭০ ভাগ সালিশ সংগঠিত হয় যৌতুকের কারণে সৃষ্ট ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য। তাই এ ব্যাপারে গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বহাল রাখার জন্য যৌতুক মুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। মোট ২২জন (১১%) যৌতুককে সামাজিক সমস্যা মনে করেন না। এ শ্রেণির এলিটেরা বেশিরভাগই বয়স্ক এবং স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় যৌতুকের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে তাদের ধারণা ক্ষীণ। তাদের মতে, যৌতুকের লেন-দেন সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ সমাজে আজও

বিদ্যমান। তাই এটিকে সামাজিক সমস্যা বলতে তারা নারাজ। উল্টো তারা ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারী গ্রামীণ এলিটদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তারা মানুষের বেলায় যৌতুককে সামাজিক সমস্যা বললেও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিয়েতে ঠিকই যৌতুকের লেন-দেন করেন। উত্তরদাতা বাকী ১৬ জন (৮%) এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন।

ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ অন্যান্য সামাজিক উৎসবের মতো ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং অনুষ্ঠানাদি সুচারূভাবে সম্পন্ন করতে গ্রামীণ এলিটরাই নেতৃত্ব প্রদান করেন। ধর্ম গ্রামীণ সমাজ জীবনকে মানা মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামবাসীর ধর্মীয় জীবনপ্রবাহে প্রভাব বিস্তার করেন। মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় শিক্ষার পথ সুগম করেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ১৭৫জন (৮৭.৫%)। সমাজের সংহতি রক্ষায় এবং সমাজের নৈতিকতা ধরে রাখতে ধর্মের ভূমিকা অনন্য। গ্রামীণ সমাজে তাই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা বরদাস্ত করা হয়না। এ ধরনের অবহেলায় কখনো কখনো আর্থিক, মানসিক অথবা শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হয় । মূলতঃ গ্রামীণ সমাজ জীবনে পরিবার ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে গ্রামীণ এসব এলিট ধর্মীয় নীতিমালাকে অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন।

ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি আয়োজনেও গ্রামীণ এলিটেরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান গবেষণা এলাকার মূল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে মহরম, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, শবে-ই-বরাত, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং ধর্মীয় জালসা উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনে গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্বে গোষ্ঠী সমাজে ব্যাপক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজের সদস্যদের ওপর নির্দিষ্ট হারে চাঁদা নির্ধারণ করা হয়, যা সমাজের সকল সদস্যদের দেয়া বাধ্যতামূলক। তবে চাঁদার হার নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর (Karim 1990:123)। পরকালীন সুখ অথবা সমাজে প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বেশি চাঁদা প্রদান করে থাকেন । ঈদুল ফিতর (রোজার ঈদ) এবং ঈদুল আযহা (কোরবানী ঈদ) গ্রামীণ সমাজে প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব। সাধারণতঃ খোলা মাঠ অথবা মসজিদে এ নামাজ অনুষ্ঠিত হয় (Karim 1990:123)। তবে বর্তমান গবেষণা এলাকায় এ ধরনের নামাজের জন্য ঈদগাহ মাঠ আছে। এসব ঈদগাহ মাঠের সার্বিক তদারকির দায়িত্ব পালন করেন গ্রামীণ এলিটেরা। সমাজের সদস্যদের প্রদানকৃত ফিৎরার টাকা 'মাতব্বর' গ্রামীণ এলিট নামাজ শেষে দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ করে দেন। ঈদুল আযহার নামাজ শেষে গ্রামীণ এলিটেরা পশু কোরবানী করে থাকেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান গ্রামের মিলন মেলায় পরিণত হয়। কোরবানীর সার্বিক আয়োজনে এবং দুস্থদের মাঝে মাংস বিতরণ ও পশুর চামড়ার মূল্য বিতরণে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন গ্রামীণ এলিটেরা।

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ সমাজে এখনো ইসলামী জালসার আয়োজন করা হয়। ইসলামী জালসা সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য অর্থ এবং শ্রম দিয়ে গ্রামীণ এলিটেরা ভূমিকা রাখেন। গ্রামের মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধিতে এবং ধর্মীয় ইবাদত নিয়মিত পালনে উদ্বুদ্ধ করতে এসব জালসার গুরুত্ব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক। তাছাড়া এসব মাহফিলকেন্দ্রিক উৎসাহ গ্রামীণ সমাজের সংহতিকে দৃঢ় করে।

গ্রামের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনে নিরলস ভূমিকা রাখেন গ্রামীণ এলিটেরা। মৃতের আত্মার শান্তির জন্য মিলাদ আয়োজনেও নেতৃত্ব দেন তারা।

নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটের মধ্যে বয়স্ক, ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ ধর্মীয় ভূমিকার প্রতি অধিক যত্নশীল এবং ভূমিকা পালনে নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন।

ধর্মীয় অনুশাসনকে গ্রামীণ সমাজ পরিচালনার অন্যতম অনুসঙ্গ বিবেচনা করা হয়। সামাজিক অপরাধ-ব্যভিচার নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় বিধি-বিধানকে প্রাধন্য দেয়া হয়। আর এই প্রেক্ষিতেই গ্রামীণ সমাজে বহুল ব্যবহৃত ফতোয়ার প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। আরবী শব্দ ‘ফতওয়া’ মূলধাতু ‘ফাতা’ থেকে এসেছে। এর অর্থ যৌবন, নতুনত্ব, সরলীকরণ বা ব্যাখ্যা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কাঠামোতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ফতোয়ার ধারণার উন্মেষ ঘটে। তখন এর বিষয় ছিল জ্ঞান। পরবর্তীতে জ্ঞান যখন হাদীসের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ফতোয়া রায় ও ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হয় (রহমান, ২০১৮:১৮১)।

নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ২৫জন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। গ্রামীণ এসব এলিট তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ যেমন মাঘী পূর্ণিমা, চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখী পূর্ণিমা, রথযাত্রা, দুর্গা পূজা, লক্ষী পূজা, কালি পূজা ও সরস্বতী পূজা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মৃতের সৎকার, শ্বশান রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন উৎসবাদি আয়োজনে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সামাজিক সুশাসন এবং এলিট

সুশাসন প্রত্যয়টি স্থানীয় অথবা জাতীয় যেকোনো সংগঠনের সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামীণ সমাজ নামক সংগঠনটির ক্রমবিকাশ এর জনগোষ্ঠীর সংহতি এবং জীবন ঘনিষ্ঠ কর্মতৎপরতার ওপর ভর করে এগিয়েছে। শতাব্দীর চাকা যতো ঘুরেছে গ্রাম এবং শহরের দূরত্ব ততো কমেছে। ফলে শুধুমাত্র জীবন, সম্পদের জন্যই নয় বরং মানবিক মর্যাদার সুরক্ষার জন্য গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের

যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছে। প্রক্রিয়াটি সহজ ছিল না। অনুগত-অনুসারীদের শর্তহীন আনুগত্য প্রদর্শনে অনীহা এবং সমাজ সংগঠনের রীতিবদ্ধ রীতি-নীতির প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করার মতো অর্জিত গুণ এবং কৌশলের অনুপস্থিতি গ্রামীণ নেতৃত্বের সনাতনী কাঠামোই বদলে দিয়েছে। পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নিজেদের মানিয়ে নেয়ার দক্ষতাসম্পন্ন নেতৃত্ব টিকেছে। তবে তাদের কৌশলের রদবদল করতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব এবং অনুসারীদের মধ্যে বোঝাপড়ার পরিবেশ অব্যাহত রয়েছে। উভয়ের জবাবদিহিতার সংস্কৃতি, নৈতিক মানদণ্ডে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচরণকে পরিমাপ করা, ন্যায়ের শাসনের প্রতি সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ সামাজিক সুশাসনের পরিচয় বহন করে। তৃণমূলে জাতীয় রাজনীতির অপরিকল্পিত বিকাশ এবং গ্রামীণ এলিটদের সমাজ সংগঠনকে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করার অপরিনামদর্শী পদক্ষেপে সেই সুশাসনের প্রক্রিয়া কখনো কখনো ব্যাহত হয়। তবে আনুষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা-কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজের অন্তরঙ্গ পারস্পরিক সমঝোতামূলক সহাবস্থান এর স্বকীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সেই স্বকীয় চেতনার ধারক, বাহক এবং রক্ষক গ্রামীণ এলিট। গবেষণা এলাকায় কিঞ্চিত ব্যতিক্রম ছাড়া গ্রামীণ এলিটেরা স্বকীয় চেতনায় সামাজিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক বলে দাবি করা যায়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও কিছু নীতি পরামর্শ

১. ধ্রুপদীকাল থেকে কেবলমাত্র গ্রামীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় এলিটদের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা হতো। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকার এক অন্তরঙ্গ চিত্র উদঘাটিত হয়েছে।

২. গ্রাম্য উপদলীয় দলাদলী (ঋধপঃরড়হ) গ্রামীণ সমাজ জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতো বলে প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিপরীতে বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ সামাজিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদানের এলিটীয় প্রতিযোগীতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে যা গ্রাম গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে ধারণা করা যায়।

৩. ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক শক্তি, বংশ মর্যাদা ও শিক্ষার সাথে সাথে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম মূল নিয়ামক উপাদান হিসেবে পাওয়া গেছে বর্তমান গবেষণায়।

৪. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে পাশ কাটিয়ে গ্রামীণ সমাজের নানা সমস্যা ও সংকট নিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের বহুমুখী উদ্যোগ সত্ত্বেও ব্যক্তি অবস্থান থেকে গ্রামীণ এলিটদের সনাতনী ভূমিকার বিদ্যমান কার্যকারিতা তাদেরকেই গ্রামীণ উন্নয়নের মূল এজেন্ট

হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে।

৫. নানা কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

৬. সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকাকে আরো বেশি সমন্বিত, কার্যকর এবং প্রাণবন্ত করা সম্ভব।

উপসংহার

স্থানীয় এলাকার অনানুষ্ঠানিক (কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ ও বটে যেমন ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ) কর্তৃপক্ষ হিসেবে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আন্তরিক প্রয়াসই তাদেরকে স্থানীয় এলাকায় এলিটীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। গ্রামীণ সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তনে তাদের যে ভূমিকা তা বিশ্লেষণের দাবি নতুন করে জোরদার হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার সামাজিক সমস্যা উত্তরণের সাথে সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন আকাঙ্খার সফল এবং পরিশীলিত বাস্তবায়ন ঘটাতে সুদীর্ঘকালব্যাপী গ্রামীণ এলিটেরা যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তবে পরিবর্তিত বাস্তবতায় এবং গ্রামীণ ধ্রুপদী সমাজ নামক সংগঠনের ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তনের কারণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা পালনেও রদবদল হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা চর্চার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা চর্চার মাত্রা গ্রামীণ সমাজে বৃদ্ধি পাওয়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রামীণ এলিটদের তুলনায় তরুণ উদীয়মান এলিটদের ক্ষমতা চর্চার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক সংগঠনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক এসব সংগঠনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠানের জন্য তাই এলিটদের মধ্যে এক ধরনের অপ্রকাশ্য প্রতিযোগিতা বজায় থাকে যা প্রধানত স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। এর ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণ তৈরি হয়। এ মেরুকরণে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি গ্রামীণ এলিটদের বিশেষ দুর্বলতা লক্ষ করা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

১. আলম, খুরশিদ, বাংলাদেশের উন্নয়নে জন-অংশগ্রণ: একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৬।

২. ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, গ্রামোন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা: মেহের পঞ্চগ্রাম নমুনা বিশ্লেষণ, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২০০৩।

৩. করিম, এ.এইচ.এম. জেহাদুল, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গবেষণায় নৃ-বৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহের প্রয়োগ: দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা, এস এম নুরুল ইসলাম (সম্পা.), সমাজ, শরীর ও পরিবেশ নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী, ঢাকা: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

৪. জানসেন, এরিক. জি. (বাংলায়), গ্রামীণ বাংলাদেশ: সীমিত সম্পদের প্রতিযোগিতা, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯০।

৫. দৈনিক বগুড়া, বগুড়া: ১৪ আগস্ট, ২০০৭।

৬. প্রথম আলো, ঢাকা: ১ জুন, ২০১৯।

৭. প্রথম আলো, ঢাকা: ২৪ এপ্রিল.২০০৭।

৮. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৯. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০১৯, ïï.হিধহমষধফবংয.মড়া.নফ.

১০. বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসস্টিকস, ২০১৮, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন, ২০১২।

১২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, মে, ২০১৯।

১৩. বেগম, রহিমা, রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ, (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

১৪. বিশ্বাস, শীলা, গ্রামীণ বাংলাদেশে বিরোধ ও বিরোধ নিস্পত্তি: সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রাবিজ্ঞান বিভাগ ২০০২।

১৫. রহমান, আতিউর, বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম, ঢাকা: প্রবর্তক প্রকাশনী, ১৯৯১।

১৬. রহমান, তারেক মুহম্মদ তওফীকুর, রাজনীতিতে আলিম সমাজের প্রভাব (বাংলাদেশ ১৯৭২-২০০১), ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স ২০১৮।

১৭. শহিদুল্লাহ্, মোহাম্মদ, গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট: কুমিল্লা জেলার উত্তর গৌহাটি ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারার বিশ্লেষণ (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৯২।

১৮. স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ১৯৯৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৯. হক, একে শামসুল ও অন্যান্য (সম্পা.), ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ঢাকা: এনআইএলজি, ২০০৩।

20. Amsden, Alice H., Dicapria, Alisa and Robinson, James (ed.), The role of Elites in Economic Development, London: Oxport University Press, 2012.

21. Bonjen, C.M. and D.M. Olson, Community Leadership: Directions for Research, Administrative Science Quarterly, Vol. IX. No. 3 December, 1964.

22. Bottomore, T.B., Elites and Society, London: C.A. Watts, 1964.

23. Chowdhury, D. Poult, New Partnership in Rural Development, New Delhi: M.N. Publishers, 1978.

24. Dahl, Robert A., Who Governs, New Haren: Yale University Press, 1963.

25. Dube, S.S., Indian Village, London: Routledge & Kegan Pal, 1951.

26. Endruweit, Gunter, Elites as agents of economic development in Verlag Waltarchiv, Hamburg, Vol. 19, Iss 1, 1984.

27. Giddens, Anthony, Elites in the British Class Structure, in P. Stansworthy and Anthony Giddens, Elites and Power in British Society, London: Cambridge University Press, 1973.

28. Hunter, Floyd, Community Power Structure: A Study of Decision Makers, Chapel Hill: The University of Garden Press, 1953.

29. Jennings, M.K., Community Influentials: The Elites of Atlanta, London: The Free Press of Glencoe, 1964.

30. Karim, A.H.M. Zehadul, Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh, (Unpublished M.A. Thesis) of the Dpt. of Anthropology, Syracuse University, USA, 1983.

31. Karim, A.H.M. Zehadul, Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages, Dhaka: University Grants Commission, 1979.

32. Karim, A.H.M., Zehadul, The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society, New Delhi: Northern Book Center, 1990.

33. Kornhauser, William, The Politics of Mass Society, London: Routledge & Kegen Pal., 1965.

34. Lasswell, H.D. et. al. The Comparative Study of Elites, Standford: Hoover Institute, 1952.

35. Linton, R., The Study of Man, New York: Appleton Century, 1936

36. Mead, G. H., Mind, Self and Society, C.W. Morris (ed.), Chicago: The University of Chicago Press, 1934.

37. Mills, C. Wright, The Power Elite, New York: McGraw Hill Book Company, 1956.

38. Pareto, Vilfredo, The Mind and Society, New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4, 1935.

39. Rahman, Atiur, Peasants and classes: A study in Differentiation in Bangladesh, Dhaka: The University Press Ltd., 1986.

40. Rumi, Syed Nasar Ahmed, Rural Elites and their Role in Development: A Case Study in Kustia District (Unpublished M.Phil. Thesis), Rajshahi University: IBS, 1985.

41. Schulze, R.O. and L.U. Blumberg, The Determination of Local Power Elites, The American Journal of Sociology, 13 (3), 1959.

42. Sebudubudu, David & Molutsi, Patrick, The Elite as a Critical Factor in National Development -The Case of Botswana, Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2011.

43. Sharma, S.S., Rural Elites in India, Delhi: Sterling Publisher, 1979.

44. Singer, Marshall, The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon, Cambridge: The Press, 1964.

45. Sing, Harjinder, Authority and Influence in two Sikh Villages, 1976.

46. T.R. Sarbin, Role Theory, G. Lindzey, (ed.) Hand Book of Social Psychology, Vol.1, and Cambridge: Mass: Adison-Wesley, 1954.